মূল্যায়ন

“আমরা বাংলা গদ্য লিখতে গিয়ে অনেকেই ইংরেজী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগ করি, কিন্তু অচেনা আরবী-ফার্সী শব্দ সম্পর্কে কি রকম যেনো একটা শুচিবাই-এর ভাব। সৈয়দ মুজতবা আলী সমস্ত সংস্কারের বাঁধ ভেঙে দিয়েছিলেন। কোন ভাষা থেকে যে কোন শব্দ নিয়ে এসেছেন প্রয়োজন মতন, হোক না আরবী কিংবা নিছক হয়নি ঠিক হলো না। তিনি লিখতে জানতেই, তাই যা খুশী লিখেছেন। ... সাহিত্য ক্ষেত্রে খুব রসিক বলে পরিচিত তারা কদাচিৎ নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করতে সাহস পান। ” (মানুষ মুজতবা আলী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) একজন লেখকের সবচেয়ে বড়ো স্বীকৃতি উত্তরসূরীদের কাছে গৃহীত হওয়ায়, একক ব্যক্তিত্ব অনায়াসে প্রভাবিত করে ফেলেন অগণিত সাহিত্যসাধকদের। ভাঙাগড়ার খেলায় সিদ্ধি তখনই সম্ভব যখন লেখক আয়ত্ত করেন শিল্পের অধরা মাধুরীকে। বলা হয়ে থাকে যে শিল্পের ইতিহাস আসলে টেকনিকের ইতিহাস, সে হিসেবে ‘চাচা কাহিনী’ রসসাহিত্য হয়ে ওঠার মূলে কী কী বিষয় কাজ করেছে তা আমাদের নিবিড় পাঠের অপেক্ষা রাখে। “ আমরা সাধারণত যে জার্মানীকে জানি, শিলার গ্যয়টে অথবা হাইনের রচনায়, মুজতবা আলীর জার্মেনী সে জার্মেনী নয়, তাঁর জার্মেনী হচ্ছে প্রতিদিনের কর্মকান্ডে প্রবাহিত নগর- জীবনের বিচিত্র মানুষের অবসর- মুহূর্তের জার্মেনী। এ জার্মেনীকে দেখা যায় বিভিন্ন শহরের বিয়ারের আড্ডায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ক্লাবের সভায়, যন্ত্রণার মধ্যেও রহস্যপ্রিয়তায়। বিদেশীরা সাধারণত এ জার্মেনীকে দেখে নি। মুজতবা আলীর সৌভাগ্য যে তিনি সে জার্মেনীকে দেখেছিলেন। এত অন্তরঙ্গভাবে একটি জাতির পরিচয় উদ্ঘাটন করা সহজ ক্ষমতার পরিচায়ক নয়।... তিনি জার্মেনীর আর্তনাদকে দেখেছেন, তার বেঁচে থাকার প্রয়াসকে দেখেছেন এবং তাকে একটি উজ্জ্বল সমৃদ্ধির মধ্যে দেখেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি এ পরিচয়গুলো তথ্যভারাক্রান্ত গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকাশ করেন নি। জার্মেনীর বিচিত্র স্বভাবের মানুষের মধ্যে তিনি জার্মেনীকে আবিস্কার করেছেন। ”- সমালোচকের এই মন্তব্য স্বীকার করে নিতে বাধা থাকে না। এ কথা খুব সত্যি যে দেশ কেবল মানচিত্রে থাকে না, দেশ থাকে মনচিত্রে। যে জীবন অন্তঃসলিলা হয়ে বয়ে চলে, যে জীবন সন্ধানী আলো ছাড়া ধরা যায় না, সৈয়দ মুজতবা আলী সে জীবনের কথাকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভাব। ‘চাচা কাহিনী’তে যে মানুষগুলির ছবি তিনি এঁকেছেন, তারা সকলেই জীবন্ত। রাগে- দুঃখে- আনন্দে- হাসিতে পুরো মানুষ। দেশ কাল আলাদা হলেও আমাদের মনে স্থান পেতে তাদের অসুবিধা হয়নি। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব লেখকের প্রাপ্য। লেখকের জীবনবোধ

এতটাই ব্যাপ্ত, অভিজ্ঞতার পৃথিবী এতটাই প্রসারিত, খুব সহজেই বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করেন। ইতিহাসকে এমন আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলেন, ধরা যায় না। আসলে কিছুই যেন উদ্দেশ্যমূলক নয়, স্বাভাবিকভাবেই উৎসারিত।

"মুজতবা আলীর ছোটগল্পের বড় বৈশিষ্ট্য আড্ডার মধ্যেই নিটোল গল্প তৈরী হয়ে যাওয়া এবং অবলীলায়। 'স্বয়ংবরা' গল্পে তাই ঘটেছে। সমস্ত গল্পেই চাচা মধ্যমণি। নিজেকে নায়ক করে গল্পের আরম্ভ ও শেষ ঘটিয়েছে চাচা। প্রত্যেকটি গল্পের শেষে যেমন হিউমার আছে, তেমনি আছে হাল্কা বিষাদ। " (সৈয়দ মুজতবা আলীর ছোটগল্প, বীরেন্দ্র দত্ত) "সত্যই তাঁর লেখার ঢঙ্ একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব- এ ঢঙ্ বৈঠকী আলাপের ঢঙ্, লিখিত সাহিত্যের রচনারীতিতে এ বস্তু নিতান্তই দুর্লভ। মৌলিক বিচারে মুজতবা আলী প্রধানতঃ একজন শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের আলাপন- শিল্পী— নেহাৎই দৈবক্রমে এবং আমাদের নিয়েছেন তাঁর লেখনীকে। " (জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ভূমিকা, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, নবম খন্ড) প্রাবন্ধিক খুব সুন্দরভাবে বলেছেন সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখায় উঠে আসা আড্ডার কথা " ...সুপণ্ডিত বিদগ্ধজনের আড্ডা; এ আড্ডায় যে-সব আলোচনা হয় তার মধ্যে বিদ্যার কৌলীন্য আছে কিন্তু আস্ফালন নেই, জ্ঞানের গৌরব আছে কিন্তু পেচক- গাম্ভীর্য নেই, সমালোচনা আছে কিন্তু ঈর্ষা বা অসূয়া নেই, রস ও রসিকতা আছে কিন্তু অশ্লীলতা নেই। " মুজতবা আলী কখনই পাঠকের থেকে উঁচু আসনে বসে কথা বসেন না। তিনি আর তাঁর পাঠক একই তলে অবস্থান করেন, নাহলে সখ্য গড়ে উঠবে কী করে? আর বিষয় কোনও স্থির থাকে না যেমন আড্ডায় তেমনি কথার পাল্টে কথায় চাচা কাহিনীতেও আমরা পাই আশ্চর্য কথামালা। এ গল্পের থেকে অন্য গল্প, এভাবে মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলে আখ্যান, সবচেয়ে বড় কথা পাঠক কখনই খেই অবসন্ন হয়ে যান না। হাসিখুশি পাঠে এ এক নতুন বর্ণ পরিচয়। আর পাণ্ডিত্য তাঁর লেখাকে ভারাক্রান্ত করেনি। রচনা মাধুর্য কোথাও ব্যাহত হয়নি। যে প্রাঞ্জলতা তিনি পাঠককে উপহার দিয়েছেন তা অনেক পরিশ্রমের ফল। প্রতিভা ও প্রেরণার কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এ প্রসঙ্গে।

" হাস্যরস অমনিবাসের সবচেয়ে কঠিনতম অধ্যয়ন হল 'হিউমার'। যার সঙ্গে কিছুটা হৃদয়বেত্তা কিছুটা পাণ্ডিত্য জড়িয়ে। দু'য়ের সঠিক মিশেল একটা অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয় মানুষকে। তখনই তাকে 'রসিক' বলা যায়। সেই তালিকায় ভারি মুষ্ঠিমেয় ক'জন—তাঁদেরই অন্যতম বিশিষ্টজন -- সৈয়দ মুজতবা আলী। " অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 'সংবাদ প্রতিদিন' এর রোববার সংখ্যায়, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ –য়। আমাদের মনে পড়তে পারে শংকরের 'চরণ ছুঁয়ে যাই' বইটির প্রথম খন্ডের কথা। যেখানে শংকর স্মৃতি চারণা করেছেন রবীন্দ্রনাথের পর

ইদানীংকালে সর্বাপেক্ষা উদ্ধৃত লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীকে নিয়ে। দুজনের কথোপকথনে উঠে এসেছে প্রাসঙ্গিক কিছু কথাবার্তা। শংকরের মতে মুজতবা আলী "... বাংলা সাহিত্যের ড্রইং রুমে সুরুচি ও সুশিক্ষাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। বাঙালি- মনের বন্ধ দরজা- জানালা খুলে দিয়ে সেখানে দেশ- বিদেশের হাওয়া ঢুকিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আপনি কুতুবমিনারের মতো তুলনাহীন। আপনার সঙ্গে তুলনীয় কোনো লেখক আপনার আগেও নেই পরেও নেই। " এর পর আলীসাহেব স্বভাবসিদ্ধ বিনম্র ভঙ্গিতে এই কথা এড়িয়ে গিয়ে বললেন- " তবে ভাষার দিক দিয়ে আমি একটু সমাজ সংস্কারের চেষ্টা করেছি। গুরু এবং চণ্ডালকে এক পঙ্‌ক্তিভোজনে বসিয়ে দিয়েছি-গুরুচন্ডালি দোষ যে আসলে গুণ তা গৌড়জনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। সেদিক থেকে আমি স্বামী বিবেকানন্দের চেলা। তোমরা অন্তত আমাকে সেইভাবে মনে রেখো। " একজন লেখক নিজের সম্বন্ধে যখন মূল্যায়ন করেন সেটি আমাদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ববাহী হয়ে ওঠে। সৈয়দ মুজতবা আলী এক কথায় অনন্য। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই।

'দেশভ্রমণ' রচনায় সৈয়দ মুজতবা আলি গ্যেটের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন- "চরিত্রবল সৃষ্টি করতে হলে জনসমাজে মেশো, কিন্তু যদি প্রতিভার সম্যক প্রস্ফুরণ তোমার কামনা হয়, তবে সাধনা কর নির্জনে। " 'দেশে বিদেশে'-র লেখক নিছক দর্শকের আমোদে দেশ দেখেননি, স্রষ্টার আনন্দ তাঁর মনে ক্রিয়াশীল ছিল। আর যার নমুনা আমরা পাই 'চাচা কাহিনী'তেও। আমরা যদি বলি 'সুন্দরের পরিপূর্ণ আনন্দ- রূপের ধ্যানের বীজমন্ত্র' তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে, তবে ভুল বলা হয় না।

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে ভূমিকা লিখেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর কিছু কথা প্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে আমাদের আলোচনায়- " ... ভাষা বহতা নদীর মতন। যদি তার স্বাস্থ্য ভালো থাকে, তা হলে যেখানে থেকে যাই সংগ্রহ করুক, কিছুতেই তার অঙ্গে মলিনতার স্পর্শ লাগে না। এই ব্যাপারটি আমাদের সবচেয়ে স্পষ্ট বুঝিয়েছেন সৈয়দ মুজতবা আলী। এই দিক থেকে তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর সার্থক উত্তরাধিকারী। সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষাশিল্প সম্পর্কে গভীর আলোচনা হওয়া উচিত। " সৈয়দ আলী আহ্‌সান লেখকের রচনাবলীর পঞ্চম খন্ডের ভূমিকা লিখতে গিয়ে শব্দের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। এটা তো খুব সত্যি যে সাহিত্য শুধু ভাবে নয় ভাষায় লেখা হয়। যেমন ম্যালার্মে বলেছিলেন কবিতা সম্পর্কে। পাঠকের বুদ্ধিকে পরিশীলিত করা, আবেগকে পরিশুদ্ধ করেন লেখকেরা শব্দের মধ্য দিয়ে। আমাদের প্রয়োজনের পৃথিবী থেকে, দৈনন্দিন ব্যবহারিক পৃথিবী থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটে এক অপূর্ব আনন্দের জগতে, তার মূলে

শব্দ। সাহিত্যের ভুবন তাই শব্দ ভুবন। " সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে হলে আমাদের ভাষায় জীবনের বিভিন্ন কর্মকান্ডে ব্যবহৃত শব্দের প্রতাপের কথা বলতে হয়। যেভাবে তিনি শব্দকে ব্যবহার করেছেন , শব্দকে তার বহুবিধ লৌকিক অঞ্চল থেকে মুক্ত করে সাহিত্যে প্রবাহিত করেছেন, মানুষের উচ্চারণগত বাণীভঙ্গীকে নির্মিত বাক্যের মধ্যে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন তার তুলনা হয় না। তিনি নিজেই নিজের তুলনা।" এরপর " বাংলা শব্দ-ব্যবহারের বিচিত্র দ্যোতনায় মুজতবা আলী নিঃসন্দেহে এক অনন্য সমৃদ্ধমান ব্যক্তি। "

সমালোচকদের আলোচনা থেকে লেখকের বিভিন্ন পরিচয় ফুটে উঠেছে। আলোচ্য গ্রন্থের সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে মনে গিয়ে আমাদের মনে হচ্ছে সৈয়দ মুজতবা আলীর 'চাচা কাহিনী'-কে এককথায় মিশ্র সংরূপ বলা যেতে পারে। সাহিত্যের পাঠকেরা অবগত আছেন যে সাম্প্রতিককালে সাহিত্যের সংরূপগত বিভাজনের ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। একটি টেক্সট সমন্বিত হচ্ছে অনেক সংরূপের বিশিষ্টতা নিয়েই। 'চাচা কাহিনী' যেমন রম্যরচনা, তেমনই একে ছোটোগল্প হিসেবে পড়া যেতে পারে। বৈঠকি সাহিত্যের গড়নে মুজতবার হাল্কা মেজাজের ভেতর সংবেদনশীল মনের খোঁজ মেলে যা পাঠকের তন্ত্রীতে আলোড়ন তোলে। এককথায় সৈয়দ মুজতবা আলীর 'চাচা কাহিনী' রসসাহিত্যে উন্নীত হয়েছে। কীভাবে একটি বস্তু সাহিত্য হয়ে ওঠে তার কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা যেন 'অন্তহীন দ্রৌপদীর শাড়ি'। তবু সে চেষ্টা চলতেই থাকবে। আর এভাবেই গড়ে উঠবে নতুন নতুন পাঠ পরিসর। বাংলা সাহিত্য কেন বিশ্বসাহিত্যেও এই আখ্যানের জুড়ি মেলা ভার।

.....

BENGALI (CBCS)/ SEM- 6 / DSE-1B : **প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনি/ চাচা কাহিনী**
Debayan Chaudhuri, Assistant Professor, Dept. of Bengali
Shahid Matangini Hazra Govt. College for Women, Purba Medinipur